ঘূর্নিঝড়, গোর্কি এবং বাংলাদেশের কান্না

ফরিদ আহমেদ

ঘূর্নিঝড় সিডর তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে আরব্য রূপকথার দৈত্যের মতো প্রচন্ড আক্রোশে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেছে বাংলাদেশকে। এরকম প্রলয়কারী দৈত্য বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে এসে প্রায়শই হামলে পড়ে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে। এই দৈত্য শুধু একা আসে না, সাথে করে নিয়ে আসে এর ঘনিষ্ট সহচরী গোর্কি বা জলোচ্ছ্বাসকেও। এদের দুজনের সম্মিলিত আক্রমনে প্রায়শই হতাহত হয় হতদরিদ্র এই দেশের দুঃখী মানুষেরা। নিমেষেই হারিয়ে ফেলে তাদের সমস্ত সহায় সম্বল। কঠোর পরিশ্রম করে দিনের পর দিন উপকূলের মানুষেরা যেটুকু সঞ্চয় করে, ঘুর্নিঝড় আর গোর্কির নির্দয় আক্রমনে সাগরে নোনা জলে বিসর্জন দিতে হয় তার সবটুকু। শুন্য থেকে সব কিছু শুরু করতে হয় আবার তাদের।

প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নিয়মিত বিরতিতেই ঘূর্নিঝড় আঘাত করে থাকে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে। পৃথিবীর যে কটি অঞ্চল ঘূর্নিঝড় প্রবন তার মধ্যে বঙ্গোপসাগর অন্যতম। এ যাবত সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষ মারা গেছে এ'রকম পনেরটা ঘূর্নিঝড়ের মধ্যে নয়টাই ঘটেছে বাংলাদেশে। ১৯৭০ সালের ঘূর্নিঝড়, যাকে পশ্চিমা বিশ্ব জানে ভোলা সাইক্লোন নামে, সেটা বিপুল বিক্রমে বসে আছে তালিকার একেবারে মাথার উপরে।

ক্ষয়ক্ষতির এই বিপুল পরিমাপ দেখে মনে হতে পারে যে বঙ্গোপসাগরের যে সকল ঘূর্নিঝড় হয় সেগুলো বোধহয় সারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়। আসলে কিন্তু তা নয়। এর চেয়েও অনেক শক্তিশালী ঘূর্নিঝড় আঘাত করেছে ফ্লোরিডাসহ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। এর মানে অবশ্য এও নয় যে খুব রোগা পটকা দুর্বল ঝড়ের আঘাতেই আমরা কাবু হয়ে যাচ্ছি। ঘূর্নিঝড়ের তীব্রতা মাপার জন্য পূরকৌশলী হার্বাট সাফির এবং ইউ এস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের ডিরেক্টর বব সিমসন ১৯৬৯ সালে পাঁচ মাত্রা বা ক্যাটাগরীর একটি স্কেল তৈরি করেন যা সাফির-সিমসন স্কেল নামে পরিচিত। ঘূর্নিঝড়ের শক্তিমত্তা বোঝানোর জন্য এই স্কেল আজো ব্যবহৃত হচ্ছে। এই স্কেলে সাধারনত নিরীহ নির্বিষ ধরনের ঝড়কে ক্যাটাগরি ওয়ানে ফেলা হয়। এর পর যতই এর তীব্রতা বাড়তে থাকে ততই এর ক্যাটাগরি সংখ্যা বাড়তে থাকে। সর্বোচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন ঝড়কে ক্যাটাগরি ফাইভ ঝড় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ক্যাটাগরি থ্রি বা এর চেয়ে বেশি তীব্রতাসম্পন্ন ঘূর্নিঝড়গুলো মেজর ঘূর্নিঝড় হিসাবে চিহ্নিত হয়। তবে সত্যিকার অর্থে কোন জনপদ লণ্ডভন্ড করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি ফোর এবং ক্যাটাগরি ফাইভের কোন জুড়ি নেই। ক্যাটাগরি ফোরের মর্যাদা পেতে গেলে যে কোন ঘূর্নিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ হতে হবে ঘন্টায় ২১০ থেকে ২৪৯ কিলোমিটার। এই ধরনের ঘূর্নিঝড়ে সাধারনত জলোচ্ছ্বসের উচ্চতা হয় ১২ থেকে ১৯ ফুট। অন্যদিকে ক্যাটাগরি ফাইভের ঘূর্নিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ থাকে ২৫০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি। জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছাড়িয়ে যায় বিশ ফুটেরও বেশি।

সিডর ক্যাটাগরি ফোর মাত্রার ঘূর্নিঝড় হিসাবে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হেনেছে। শক্তির দিক দিয়ে এটা ছিল বছর দুয়েক আগে লুজিয়ানায় আঘাত করা হারিকেন ক্যাটরিনার সমপর্যায়ের বা সামান্য কিছুটা বেশি

শক্তির। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির এবং প্রাণহানির দিক দিয়ে সিডর বহুগুনে ছাড়িয়ে গেছে ক্যাটরিনাকে। মৃতের সংখ্যা এর মধ্যেই পাঁচ হাজার অতিক্রম করে গেছে। এখনো উদ্ধার করা হচ্ছে অগুনতি লাশ। বিভিন্ন জায়গায় বহু লোকের কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। রেডক্রস আশংকা করছে যে মৃতের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

উত্তর ভারত মহাসাগর বেসিন (আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর এলাকা) হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র অঞ্চল যেখানে ঘূর্নিঝড়ের মৌসুম বছরে দুইটা। প্রথম মৌসুম হচ্ছে এপ্রিল/মে মাসে এবং দ্বিতীয় মৌসুম হচ্ছে অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এরকম বিচিত্র দ্বিখন্ডিত মৌসুম হওয়ার মূল কারন হচ্ছে, এই অঞ্চলে গ্রীস্মকাল এতো তীব্র যে ওই সময় মৌসুমী ভূ-পৃষ্ঠীয় নিম্নচাপ সমুদ্র থেকে উত্তরে ভূমির দিকে সরে আসে। ফলে উপরের বাতাস জেট স্ট্রিম শক্তিতে ৫০ থেকে ৮০ মাইল গতিতে পূর্ব বা পূর্ব-উত্তর দিক থেকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে, সাগরে সাইক্লোন তৈরি হওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দু"টো সংক্ষিপ্ত মৌসুম রয়েছে ঘূর্নিঝড় তৈরি হওয়ার জন্য। একটি গ্রীস্ম শুরু হওয়ার আগে (এপ্রিল/মে), যখন উপরের বায়ু শক্তিশালী হওয়ার আগেই মৌসুমী ভূ-পৃষ্ঠীয় নিম্নচাপ সাগরের উপর অবস্থান করছে। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রীস্মের পর (অক্টোবর/নভেম্বর), যখন মৌসুমী ভূ-পৃষ্ঠীয় নিম্নচাপ দক্ষিনে সাগরের উপর সরতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে দক্ষিন গোলার্ধে গিয়ে ধীরে ধীরে বিলীন এবং রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সময় উপরের বায়ু সাময়িকভাবে খুব দুর্বল থাকে বলে দুই একটা ঘূর্নিঝড় তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য ঘূর্নিঝড় প্রবন এলাকার তুলনায় এই বেসিন খুব একটা সক্রিয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে তৈরি হওয়া ঘূর্নিঝড়গুলোই সবচেয়ে বেশি মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের ঝড়গুলোর কুকীর্তি রীতিমত পৃথিবী বিখ্যাত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম শক্তিশালী বা একই মাত্রার ঘূর্নিঝড় হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রানহানি এবং ক্ষতির পরিমান এতো বেশি কেন?

বাংলাদেশে ঘূর্নিঝড়ে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির একটা অন্যতম কারন হচ্ছে এর সাথে ধেয়ে আসা গোর্কি বা জলোচ্ছ্বাস। সাধারনত কোন একটি ঘূর্নিঝোড়ে যে পরিমান উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কথা বাংলাদেশে তার থেকে বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে উপকূলে। বঙ্গোপসাগরের গভীরতা এবং এর ভূ-আকৃতিই এর জন্য দায়ী। মহাদেশীয় খাদ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগরের গভীরতা খুবই কম। ঘূর্নিঝড়ের ফলে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা বিপুল জলরাশি সাগরের তলদেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফুলে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতিতে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা হয় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের আকৃতি অনেকটা ফানেলের মতো এবং এই ফানেলের একেবারে নল বা গোড়ার দিকে বাংলাদেশের অবস্থান। ফলে তিন পাশের পানির চাপ এসে মিলিত হয় বাংলাদেশের উপকূলে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের এক বিস্তীর্ন অঞ্চল সমতল এবং মোটামুটি সমুদ্র সমতলে অবস্থিত বলা যেতে পারে। এই এলাকার জনবসতিও পৃথিবীর যে কোন উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি ঘন। অনেক দ্বীপ বা চরে কোন সাইক্লোন সেন্টারও নেই। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জলোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিকভাবেই এই সব

দ্বীপ বা চরাঞ্চলসহ উপকূলীয় বিস্তীর্ন অঞ্চল ডুবে যায়। সর্বনাশা গোর্কি ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদের।

উপকূলীয় অঞ্চল এতো বেশি দূর্গম যে, লোকজনকে ঠিকমত সতর্ক করা বা নিরাপদ স্থানে সরিয়েও নেওয়া যায় না সময়মত। বিপুল সংখ্যক লোককে বিপদজনক এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য যে ধরনের আয়োজন সরকারের থাকা দরকার তাতেও ঘাটতি রয়েছে স্পষ্টত। এছাড়া একটা অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে সিগন্যাল ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ঘূর্নিঝড় সতর্কীকরনের জন্য যে সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় তা মূলত বন্দরকেন্দ্রিক। ব্রিটিশরা এই সিগন্যাল ব্যবহার করতো তাদের বানিজ্য জাহাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য। এই সিগন্যাল সাধারন লোকজনকে সাইক্লোন সতর্কতার ক্ষেত্রে সঠিক পুর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়।

১৯৯১ সালের ঘূর্নিঝড়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নেহাল করিম তার এক গবেষনাপত্র "Options for Cyclone Protection: Bangladesh Context" এ লিখেছেন,

> "একানব্বই সালের ঘূর্নিঝড়ের বিশ্লেষকরা এই মর্মে উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান সতর্কতা সংকেত সাধারন লোকজনের জন্য তথ্য সরবরাহের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। ঝড়ের পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহৃত নম্বরে যেহেতু টেকনিক্যাল তথ্য রয়েছে কাজেই এটা মূলত বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে। আরো অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের ঝড়ের পূর্বাভাসের সিগন্যাল বহু লোকেই বিশ্বাস করেনি, কেননা, ১০ নম্বর সতর্কতা সংকেত (যার মানে মহা বিপদ) এর আগেই কয়েকবার জারি করা হয়েছিল কিন্তু কোন ঘূর্নিঝড় আসেনি। ১৯৯১ সালে ঘূর্নিঝড় আঘাত হানার বেশ আগেই 'মহাবিপদ' সংকেত জারি করা হয়েছিল, কিন্তু যখন এর তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় নতুন এবং আরো জরুরি কোন সতর্কতা জারি করার প্রয়োজন ছিল। ঝড়ের আসন্ন আগমন জনগনের কাছে জানানো সম্ভব হয়নি।"

ঘূর্নিঝড়ের বিষয়ে আমাদের সচেতনতারও ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এটাকে সরকার এবং গণমাধ্যমেরও ব্যর্থতা বলা যেতে পারে। পত্রিকায় দেখলাম এক জেলেকে সাগর থেকে অচেতনভাবে উদ্ধার করার পর সে বলছে য্ তারা ট্রলার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ফিরে আসছিল। এতো তাড়াতাড়ি যে ঝড় এসে যাবে সেটা নাকি তারা বুঝতেই পারেনি। শুধু এই জেলেই নয়, উপকূলবাসী অসংখ্য লোকই জানে না ঘূর্নিঝড় কখন আঘাত হানবে বা এর প্রস্তুতি হিসাবে কি কি করনীয় প্রয়োজন।

আমি ক্যানাডা থেকে মায়ামিতে এসেছি এ বছরের প্রথম দিকে। ফ্লোরিডা যে সবচেয়ে হারিকেন প্রবন এলাকা সেটা মোটামুটি সকলেরই জানা। কিছুদিন পরপরই হারিকেন এসে বিষাক্ত ছোবল মারে ফ্লোরিডার বুকে। এখানে আসার পর থেকেই দেখছি লোকজনের আলোচনার বিষয়বস্তুর অনেকখানিই হারিকেনকে ঘিরে। প্রত্যেকটা লোকই খুব ভাল করে জানে হারিকেন এলে কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে। ওয়াল মার্ট, সিয়ার্স বা কে-মার্টের মতো বড় বড় স্টোরগুলোতে হারিকেন প্রস্তুতির যাবতীয় উপাদানের আলাদা সেকশনই আছে।

সরকারেরও ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলায়। হারিকেন সিজনের আগেই রাস্তার পাশের গাছ-পালার বাড়তি ডাল-পালা কাটার দৃশ্য চোখে পড়বে আপনার। ঝড়ের সময় গাছপালার ডাল ভেঙে বিদ্যুত সরবরাহ যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য এই ব্যবস্থা। গণমাধ্যমে প্রতি নিয়ত হারিকেন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এর প্রস্তুতি নিয়ে জনগণকে ধারনা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি টেলিফোন বুকেও হারিকেন প্রস্তুতির যাবতীয় বিষয়াদি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা আছে। কোন হারিকেন ফ্লোরিডার উপকূলের দিকে বিপদজনকভাবে এগুতে থাকলেই চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। হারিকেন যেখানে আঘাত করতে পারে সেখানকার লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত হয়ে থাকে সর্বশক্তি এবং চরম দক্ষতা নিয়ে। ১৯৯২ সালে মায়ামিতে আঘাত করেছিল ক্যাটাগরি ফাইভের হারিকেন এন্ড্রু। সেই ভয়ংকর আঘাতেও মানুষ মারা গিয়েছিল মাত্র তিন ডজন। উন্নত পূর্বাভাস এবং সুদক্ষ প্রস্তুতির কারনেই হতাহতের সংখ্যা এতো কমে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের এই গরীব দেশে আমরা হয়তো আমেরিকানদের মতো এতো কিছু করতে পারবো না। কিন্তু কিছু কিছু জিনিষ যেগুলো আমাদের নাগালের মধ্যে আছে সেগুলোতো ইচ্ছা করলেই আমরা করতে পারি। ঘূর্নিঝড়ের পূর্বাভাস আধুনিক এবং জনগনের জন্য বোধগম্য করা, দেশের লোকজনকে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদেরকে ঘূর্নিঝড়ের বিষয়ে সচেতন করা এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষ করে তোলা বোধহয় খুব একটা কঠিন কাজ না। এছাড়া ঘূর্নিঝড়ের সময় গণমাধ্যম বিশেষ করে রেডিও এবং টেলিভিশনকে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। ঝড়ের গতিপথ, তীব্রতা, কোথায় এবং কোন অবস্থানে আছে, কোন অঞ্চলে আঘাত করতে পারে তার নিয়মিত প্রচার করতে হবে। এছাড়া সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকার লোকজনের কি করণীয় সে বিষয়েও পরামর্শ দিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড় হবে তার জন্য দেশের অন্য এলাকার লোকজন গান-বাজনা নাটক থেকে বঞ্চিত হবে কেন, এমন অনুভূতিহীন নিষ্ঠুর আচরন যেন গণমাধ্যমগুলো না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

সেদিন আমার পরিচিত একজন বাংলাদেশী দুঃখ করে বলছিলেন যে, তিনি ঝড়ের খবরাখবর নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে যেয়ে দেখেন যে, সেখানে বেশ জমিয়ে নাচ গানের অনুষ্ঠান চলছে। তিনি মায়ামিতে প্রায় ষোল-সতের বছর ধরে আছেন। জানালেন যে, হারিকেনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই এখানকার টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মূখ্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে হারিকেন।

আমাদের দেশে অনেক কিছুর অভাব থাকলেও মানুষের সাহসের কোন অভাব নেই। বঙ্গীয় এই ব-দ্বীপে যুগে যুগে প্রকৃতি তার নিষ্ঠুর আক্রমন চালিয়েছে। আর প্রতিবারই সাহসী মানুষেরা ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে জীবন শুরু করেছে। এই ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের পরেও যে উপকূলের সাহসী মানুষেরা আবার ঘুরে দাঁড়াবে সে বিষয়ে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই। শুধু প্রয়োজন এই সব অমিত তেজী মানুষদের পাশে গিয়ে একটুখানি দাঁড়ানো। ছোট্ট একটু সহানুভুতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আসুন, এই সামান্য কাজটুকু আমরা সবাই মিলে করি।

মায়ামি, ফ্লোরিডা